গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৫ সংখ্যা ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পেট্রোল-ডিজেলের
অন্যায় মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার কর

৩১ আগস্ট মধ্যরাত থেকে আবার পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে বলেন যে, মূল্যবৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি অন্যায়। এভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রের জনবিরোধী বিজেপি জোট সরকার পুঁজিপতিশ্রেণীর নির্মম শোষণে জর্জরিত সাধারণ মানুষের উপর আবার প্রবল আঘাত হানল। এই অন্যায় সিদ্ধান্ত এখনই প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তিনি এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

ইজরায়েলী প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের প্রতিবাদে সোচ্চার হোন

— নীহার মুখার্জী

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ট ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী প্যালেস্টিনীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধ্বংস করে দিয়ে সে দেশে ইজরায়েলি দখলদারি চালিয়ে যাওয়ার ঘৃণ্য মতলব থেকে হাজার হাজার প্যালেস্টিনীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে হত্যা করে চলেছে। এহেন যুদ্ধবাজ ও মার্কিন তাঁবেদার প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে ২৯ আগস্ট ২০০৩ এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এক বিবৃতিতে ইজরায়েলের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা কসাই সরকারের সাথে এদেশের বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিপজ্জনক মিত্রতা এবং তাঁকে ভারতে আমন্ত্রণ জানানোর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এই ঘটনা যেমন বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের উপর গুরুতর আঘাত হেনেছে, তেমনই আমাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যের উপর কলঙ্ক লেপন করেছে।

শ্যারনের এই সফরের তীব্র বিরোধিতা করার জন্য এবং বিজেপি সরকার তাদের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদমুখী নীতির অঙ্গ হিসাবে ইহুদিবাদী ইজরায়েল সরকারের সাথে যেভাবে গাঁটছড়া বাঁধতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য কমরেড মুখার্জী জনগণের কাছে আবেদন করেছেন।

মালিকী অত্যাচার, পুলিশ প্রশাসনের চাপ, গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ সত্ত্বেও চটকল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে রইলো দশ দিনের চটকল ধর্মঘট

গত ১৮ আগস্ট থেকে রাজ্যের চটকলগুলিতে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী) তথা বেঙ্গল জুটমিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সহ ৬টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। সমকাজে সমবেতন, উৎপাদন ভিত্তিক বেতননীতি বাতিল করা, চটশিল্পের পুরনো বেতন কাঠামো ভেঙ্গে বেতন কমিয়ে ১০০ টাকা করার চুক্তি বাতিল করা, বর্ধিত ডি-এ, বোনাস, পি এফ এবং গ্রাচ্যুইটির দাবিতে ডাকা এই ধর্মঘটে চটকল শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং বিপুল উদ্যমে সাড়া দেয়। ৩৭টি চটকলে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। অন্যান্য জুটমিলগুলিতেও শ্রমিকরা ভালোভাবেই সাড়া দেয়। পুলিশ-সিটু মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী ও পনেরটি ইউনিয়নের সম্মিলিত আক্রমণ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও চটকল শ্রমিকরা যেভাবে বীরত্বপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে ধর্মঘট চালিয়ে গেছেন তা চটকল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজবিরোধী ও সিটুর গুণ্ডাবাহিনী যেভাবে শ্রমিকদের টেনে হিঁচড়ে কোয়ার্টার থেকে নিয়ে এসে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কাজ করতে বাধ্য করেছে, ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে তা '৭৪-এর কুখ্যাত কংগ্রেসী জমানার জবরদস্তি, পুলিশ মিলিটারি দিয়ে রেল ধর্মঘট ভাঙ্গার স্মৃতিকে মনে জাগিয়ে দেয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সমস্ত ভয়ভীতি আক্রমণ উপেক্ষা করে দশদিন এই ধর্মঘট চলে। চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক এবং দমনমূলক মানসিকতা নিয়ে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী দশদিনের মধ্যেও কোন ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকেননি। গত ২৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি অব জুটের একটি মিটিং ডেকে এই ধর্মঘটের বিষয়টিকেও আলোচ্যসূচিতে রাখেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই মালিক এবং মালিকঘেঁষা সিটু এই বৈঠকে যোগ না দিয়ে, বৈঠক যাতে কোন মতেই ফলপ্রসূ না হয় তার চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রক, বস্ত্রদপ্তর, রাজ্য সরকার, ইউনিয়ন এবং মালিকপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে তিন মাসের মধ্যে চটশিল্পের শ্রমিক এবং মালিকদের সমস্যাগুলিকে খতিয়ে দেখে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের ভিত্তিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকে বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করা হবে — এই প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মঘট স্থগিত রাখার আবেদন জানায় ধর্মঘটী ইউনিয়নগুলিকে। মালিকদেরও নির্দেশ দেওয়া হয় যে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য কাউকে কোন ধরনের শাস্তি দেওয়া যাবে না। এরই ভিত্তিতে ধর্মঘটী ইউনিয়নগুলি ধর্মঘট সাড়ে তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে উল্লেখ্য যে ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরও শ্রমিকদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকে কয়েকটি মিল মালিক 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' ঘোষণা করে অথবা অন্য ভাবে মিল বন্ধ করে দেয়। কামারহাটি, গ্যাঞ্জেস এবং হুগলি জুটমিল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শ্রমিকদের মনে রাখতে হবে, প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় এই চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনে প্রয়োজন ছিল সঠিক নেতৃত্বের এবং গড়ে তোলা দরকার ছিল শ্রমিকদের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার 'শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি'গুলি। শুধু স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর করে মালিক-পুলিশ-প্রশাসন এবং সিটু আশ্রিত গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণকে দীর্ঘদিন প্রতিরোধ করা যায় না। এর জন্য গড়ে তুলতে হবে অসংখ্য 'শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি' এবং 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'। ওই কমিটিগুলিতে বসে শ্রমিকদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং নেতৃত্বকেও যাচাই করে নিতে হবে। এই ধর্মঘট দেখিয়ে দিল যে, সরকার, মালিকপক্ষ এবং তাদের পেটোয়া ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ, তারা সহজে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেবে না। ফলে শ্রমিকদের সামনে আরও ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী লড়াই ছাড়া বাঁচার অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই।

৩১ আগস্ট শহীদ স্মরণে রানী রাসমণি রোডে জনসভা। (সংবাদ দুয়ের পাতায়)

জনবিরোধী বিদ্যুৎনীতি
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই দায়ী

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩০ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই জনবিরোধী বিদ্যুৎনীতির জন্য দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকারের 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' — প্রকৃতপক্ষে অনেকাংশেই রাজ্য সরকারের ২০০১ ও ২০০৩ সালের সংশোধিত বিদ্যুৎ আইনের কার্বনকপি মাত্র।

সি পি আই (এম) নেতৃত্ব গত ২১ আগস্টের বাংলা বন্‌ধের অসাধারণ সাফল্যে উদ্বিগ্ন হয়ে এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নে দলের ভিতরে ও বাইরে কোণঠাসা হয়ে সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের গা বাঁচাবার জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

জনসাধারণের কাছে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের দলও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।"

আবার কীটনাশক পাওয়া গেল

ভারতে নরম পানীয় কোম্পানিগুলি উৎপাদনের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখছে না, সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যাণ্ড এনভায়রনমেন্টের (সি এস ই) আনা এই অভিযোগ সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরির (সি এফ এল) যাচাইয়ের ফলাফলেও সমর্থিত হয়েছে। সি এফ এল পেপসি ও কোক কোম্পানির ছয়টি ব্র্যাণ্ডে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি কীটনাশক বিষ পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রকের অধীন কলিকাতাস্থিত সংস্থা সি এফ এল-এর কাছে ডাইরেকটরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস কীটনাশকের মাত্রা নির্ধারণের জন্য নরম পানীয়ের যে নমুনা পাঠিয়েছিল, তা পরীক্ষা করে সি এফ এল ফলাফলে বলেছে — মাউন্টেন ডিউ, মিরিণ্ডা অরেঞ্জ, মিরিণ্ডা লেমন (পেপসিকোর সব ব্র্যাণ্ড) কোকাকোলা, ফান্টা ও থামস আপ (কোকাকোলা ইণ্ডিয়ার ব্র্যাণ্ড) — এইগুলিতে ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি নির্ধারিত ০.০০০৫ মিগ্রা/লিটার থেকে বেশি কীটনাশক পাওয়া গিয়েছে।

(ডেকান হেরাল্ড, ৩১.৮.০৩)

বর্ধমানে স্বনিযুক্তি সমিতির বিক্ষোভ

ক্রমাগত চাকরির সুযোগ হ্রাস, কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া, সরকারি দপ্তরগুলিতে এমনকি শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও নতুন নিয়োগ বন্ধ রাখার প্রতিবাদে, স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ঋণ নেওয়া বেকারদের হয়রানির প্রতিবাদে এবং চাকরি ও জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি করার দাবিতে ২৭ আগস্ট স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতি, বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে আসা ছয় শতাধিক বেকার যুবকদের এক বিক্ষোভ মিছিল বর্ধমান রেল স্টেশন থেকে বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে জেলা শাসকের দপ্তরে যায়। সেখানে সারা দিন তারা অবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

সমিতির জেলা সম্পাদক তপন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ)কে দশ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করে। উল্লেখ্য, আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও জেলাশাসক অনুপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমিতির রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাস এবং তপন চক্রবর্তী, অশোক ব্যানার্জী, অসিত কোঙার। সভা পরিচালনা করেন সমিতির জেলা সভাপতি মহম্মদ জাকারিয়া।

কলকাতার আই ডি হাসপাতালে ডেপুটেশন

রাজ্যে সংক্রামক রোগের একমাত্র বড় (রেফারেল) হাসপাতাল বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে ডিপথেরিয়ার মতো প্রাণঘাতী রোগের ওষুধ নেই। অথচ কলকাতা সহ রাজ্যের জেলাগুলি থেকে ডিপথেরিয়া রোগীদের এখানে রেফার করে পাঠানো হচ্ছে।

রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার এই বেহাল অবস্থার চিত্র তুলে ধরে ডিপথেরিয়ার ভ্যাকসিন ও ওষুধ সহ সবরকম জীবনদায়ী ওষুধের সরবরাহ অটুট রাখা ও চিকিৎসার উন্নতিসাধনের দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ২৮ আগস্ট আই ডি হাসপাতাল সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৬ আগস্ট কটকের শহিদ ভবনে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট জননেতা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত। (পাশে) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সীতেশ দাশগুপ্ত ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী

বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র আন্দোলনের জয়

২৯ আগস্ট রাজ্যের বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সল্টলেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভারসিটি অব টেকনোলজির সামনে বিজয় মিছিল করে। এদিনই কর্তৃপক্ষ তাদের মূল দাবি লিখিতভাবে মেনে নেন। এই সমস্ত বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপকের অভাব ল্যাবরেটরির অভাব প্রভৃতি সমস্যা রয়েছে। এরই সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কিছু নতুন নিয়ম প্রবর্তনের ফলে ছাত্রছাত্রীদের 'বছর নষ্ট' হওয়ার উপক্রম হয়, তাদের পরীক্ষা দেওয়ার বিষয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এরই প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নামে। ডেপুটেশন, অবস্থান, ঘেরাও প্রভৃতি চলতে থাকে। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে

জানায় ২৪ আগস্টের মধ্যে দাবি পূরণ না করলে তারা অনশনে বসতে বাধ্য হবেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি সহজে মানতে চাননি। অবশেষে ছাত্রছাত্রীরা ২৫ আগস্ট থেকে কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে গণঅনশনে সামিল হয়। চারদিন অনশন চলে। এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায় সারা ভারত ডি এস ও। ছাত্রছাত্রীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চাপে অবশেষে কর্তৃপক্ষ তাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার দাবি মেনে নেন। এই সাফল্যের জন্য এ বি পি এস ও'র আহবায়ক তিতাস চ্যাটার্জী, সওগাত চৌধুরী ও অর্ণব মুখার্জী ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রাজ্য সরকার বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলার অনুমতি দিয়ে বলেছিল, এর ফলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটবে। কিন্তু প্রচারের রেশ কাটতে না কাটতেই দেখা গেল ছাত্ররা সমস্যার রাহুগ্রাসে পড়েছে। প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা গড়ে তুলেছে আন্দোলনের হাতিয়ার সারা বাংলা বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র সংগঠন (এ বি পি ই এস ও)। তারা দাবি জানাচ্ছে পড়াশুনার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার, ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করার। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়িক লক্ষ্যে গড়ে ওঠা এই সমস্ত পরিকাঠামোহীন কলেজগুলিতে পড়াশুনা হয়ে দাঁড়িয়েছে উপলক্ষ্য মাত্র। লিলুয়ার কলেজটি খুলেছেন শিল্পপতি কাজোরিয়া, শিক্ষা এখন এদের কাছে লোভনীয় ব্যবসাক্ষেত্র। ছাত্রদের কথা শুনতে কাজোরিয়া তাদের ডেকে পাঠান বড়বাজারের গদিতে, যদিও ছাত্ররা সেখানে যায়নি। মুনাফা অর্জনই আসল লক্ষ্য হওয়ায় তার বলি হচ্ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের গুণাগার দিতে হচ্ছে। এই অবস্থায় তাদের মনে ক্ষোভ সঞ্চিত হলেও নিজস্ব সংগঠনের অভাবে তার সংগঠিত প্রকাশ ঘটছিল না। প্রতিকারের রাস্তাও তারা পাচ্ছিল না। এ বি পি ই এস ও গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে সেই অভাব পূরণ হয়।

৩১ আগস্ট

'৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন ও '৯০ সালের ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের শহীদ স্মরণে সভা

৩১ আগস্ট '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের ও '৯০ সালের ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের শহীদ স্মরণে এস ইউ সি আই সহ আন্দোলনের শরিক দলগুলির আহবানে রাণী রাসমণি রোডে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভা শুরুর আগে, কিশোর শহীদ মাধাই হালদারের গুলিবিদ্ধ হওয়ার মুহূর্ত ৩-২০ মিনিটে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন এস ইউ সি আই, ওয়ার্কার্স পার্টি, সি পি আই এম এল-লিবারেশন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এদিন সকালে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে খাদ্য আন্দোলনের শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান হয়। সমগ্র রাজ্যে, এলাকায় এলাকায় এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগ শহীদ বেদী স্থাপন ও শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান হয়।

রাণী রাসমণি রোডে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বলশেভিক পার্টির প্রবীণ নেতা কমরেড চিত্ত নাথ। বক্তব্য রাখেন, ওয়াকার্স পার্টির পক্ষে কমরেড চিত্ত গোস্বামী, সি পি আই এম এল-এর পক্ষে কমরেড দিলীপ ব্যানার্জী। এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল তাঁর ভাষণে কেন্দ্রের ও রাজ্যের অগণতান্ত্রিক বিদ্যুৎ আইনগুলি বাতিল করা, শিক্ষায় ক্যাপিটেশন ফি বাতিল করা, হাসপাতালের বর্ধিত চার্জ প্রত্যাহারের দাবিতে এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন সহ সমস্ত পরিষেবার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও তীব্র করার আহবান জানান।

রাজ্য সরকারের নয়া কৃষিনীতি ম্যাকিনসে প্রস্তাবের প্রতিলিপি

নানা টালবাহানা এবং বাদানুবাদের পর অবশেষে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার শীতকালে রবি মরসুমে নতুন কৃষিনীতি রূপায়ণের জন্য তিন দফা কর্মসূচি নিচ্ছে বলে সংবাদে প্রকাশ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পরামর্শদাতা সংস্থাকে বহু টাকা দিয়ে নিয়োগ করে যে পরামর্শ সি পি এম কিনেছে, তা-ই কিছু কাটছাঁট করে, সংসদীয় বিরোধীদের 'ম্যানেজ' করে এখন তারা চালু করছে। বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী এবং কৃষক খেতমজুরের স্বার্থবিরোধী এই নীতির বিরোধিতা এস ইউ সি আই দল এবং দলের কৃষক সংগঠন কে কে এম এস, প্রথম থেকেই করছে এবং ম্যাকিনসের প্রস্তাবের মূল সুর ও লক্ষ্যকে বজায় রেখেই কিছু কাটছাঁট করে, সাজগোজ বদলে যে নয়া কৃষিনীতি সি পি এম চালু করতে যাচ্ছে — আমাদের পক্ষ থেকে তারও তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। এখন দেখা যাক, কী আছে এই কৃষিনীতিতে, কী এর উদ্দেশ্য এবং ম্যাকিনসের পরামর্শের সঙ্গে এর মিল কতখানি।

বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে শিল্পক্ষেত্রের মত কৃষিক্ষেত্রেও নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের কথা ভাবছিল। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন — 'মুক্ত অর্থনীতির ফলে কৃষিকাজে পুঁজিবিনিয়োগের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।' (আনন্দবাজার ১১-৫-৯৭) জ্যোতিবাবুর এই ঘোষণার আগেই রাজ্য সরকার কৃষিক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পুঁজিকে উদারহস্তে সাহায্য করার কার্যক্রম নিতে শুরু করেছিল। ১৯৯৬ সালে সরকার ভূমিসংস্কার আইনের ১৪ (জেড) ধারার সংশোধন করে। উদ্দেশ্য ছিল চা বাগান, রবার শিল্প ইত্যাদি স্থাপনের জন্য শিল্পপতিদের ইচ্ছামতো জমি সরবরাহ করা। এই সময়ে বর্গাদার আইনেরও পরিবর্তন করে ছলে বলে কৌশলে তাদের জমি থেকে বিতাড়িত করা হয়। রাজ্য সরকারের এই কাজ শিল্প মালিকদের খুশি করলেও তারা মনে করতে থাকে — এই পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। তারা বলে — চাই এমন একটা সুসংহত নীতি প্রণয়ন, যার বলে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পুঁজির অবাধ প্রবেশে এখনও যতটুকু বাধা আছে তা দূর করা যাবে। গুরুত্ব দিয়ে এই দাবিকে ভাষা দিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। ৬ কোটি টাকা দিয়ে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ম্যাকিনসেকে ভাড়া করা হয়েছে। তারাও রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের সহজতম রাস্তা বাতলে দিয়েছে। এবং তার উপর ভর করেই রচিত হয়েছে রাজ্য সরকারের কৃষিনীতির প্রথম খসড়া। কিন্তু এই খসড়া নিয়ে ভিতরে বাইরে প্রবল সমালোচনা হওয়ায় আরও দুটি খসড়া রচনা করা হয় এবং শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গত ৬ মার্চ, ০৩ রাজ্য সরকারের কৃষিনীতির চূড়ান্ত রূপরেখা প্রকাশ করেন।

এই নীতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সরকার বলেছে — "এই রাজ্যে এই কৃষিনীতির মূল লক্ষ্য হল, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। যাতে খাদ্যনিরাপত্তা বজায় থাকে এবং সাধারণ কৃষক, খেতমজুর ও গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পায়।" কিভাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে সে প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে — যেসব কৃষিপণ্যের "বাজার রাজ্যের মধ্যেই আছে, সেগুলির যতদূর সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করে ঘাটতি কমিয়ে আনা, এবং কৃষক যাতে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পায় তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা। একই সঙ্গে প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যাতে সাধারণ কৃষকের স্বার্থে উৎপাদন ব্যয় কমে যায়, বিশ্বায়নের অসম আগ্রা-সনকে মোকাবিলা করে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বাজার রক্ষা করা যায় এবং প্রয়োজনে রপ্তানিও করা যায়।"

সংক্ষেপে, লক্ষ্য বলতে যা বলা হয়েছে তাহল — (ক) খাদ্যনিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, (খ) কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা, (গ) খেতমজুর ও গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ানো। সরকারি ভাষ্যের এই লক্ষ্য পূরিত হতে পারে যদি — (১) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, (২) উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, (৩) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা যায় এবং (৪) বিশ্বায়নের অসম আগ্রাসনকে মোকাবিলা করে একদিকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বাজার রক্ষা করা, অন্যদিকে বিদেশের বাজার দখল করা যায়।

ঘোষিত লক্ষ্য এবং তা বাস্তবায়নের উপায় হিসাবে যে সব কথা বলা হয়েছে — কেউ যদি মনে করেন গৃহীত কৃষিনীতিতে তারই বিস্তৃত পরিকল্পনা করা হয়েছে তবে তিনি হতাশ হবেন। উদাহরণ হিসাবে 'কৃষকের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের' কথাই ধরা যাক। সবারই এটা জানা, কৃষিপণ্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পজাত উপকরণ — সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদির দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এবং তা ক্রমশই কৃষকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। গ্রামীণ কৃষি জীবনে এই ভয়াবহ সমস্যার প্রতিকার হওয়া একান্ত জরুরি। তাই কৃষক আন্দোলনের একটা স্বাভাবিক দাবি হল — চাষীকে সস্তা দরে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের হলেও এটা বাস্তব সত্য, গত ২৬ বছরের শাসনে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার এসব শিল্পপণ্য সস্তা দরে সরবরাহ করা তো দূরের কথা — কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সাথে পাল্লা দিয়ে এই সমস্ত পণ্যের দাম বাড়িয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, এই রাজ্যেই কৃষককে সবচেয়ে বেশি দামে বিদ্যুৎ ক্রয় করতে হয়। দিল্লীতে, বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের বৈঠকে রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী একথা অস্বীকার করতে পারেননি।

সে যাই হোক, কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমানোর কথা বললেও, গৃহীত কৃষিনীতিতে সেই একই ধারা বজায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সুপারিশ যা করা হয়েছে তাতে চাষের খরচ বাড়বে ছাড়া কমবে না। গৃহীত কৃষিনীতির ৬.৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে — "ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে বেনিফিসিয়ারি কমিটির মাধ্যমে এলাকার মানুষকে যুক্ত করে সুফল পাওয়া গেছে। এই পদ্ধতি এখন প্রতিটি ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহৎ সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও কার্যকরী করা হবে, যাতে পঞ্চায়েতের সাধারণ তত্ত্বাবধানে বেনিফিসিয়ারি কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পগুলির দায়িত্ব নেন উপকৃত পরিবারের প্রতিনিধিরাই, বিশেষ করে বেকার যুবক যুবতীরা। প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোচনার ভিত্তিতে জলকর স্থির করা হবে, যাতে প্রকল্প চালানোর স্থানীয় খরচ উপকৃতদের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয় এবং স্থানীয়ভাবে ব্যয় হয়।" নানা কথার আড়ালে আসল কথা হল সেচের খরচ চাষীকেই বহন করতে হবে — সরকার সামান্য যা দায়িত্ব পালন করত তাও করবে না। অর্থাৎ চাষে সেচের খরচ বাড়বে, জলের দাম বাড়বে এবং এইভাবেই রাজ্য সরকার কৃষি

চারের পাতায় দেখুন

বাস মালিকদের ধর্মঘট প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গে বাসমালিকদের ডাকা ২৬, ২৭, ২৮ আগস্টের তিনদিনের বন্‌ধ চব্বিশ ঘণ্টা কাটার আগেই ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় তুলে নেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার বাসমালিকদের প্রাথমিক দাবি মেনে নেওয়ায় মালিকপক্ষই বন্‌ধ প্রত্যাহার করেছে। বাসমালিকদের সংগঠনের নেতারা বলেছেন, সরকারের যে চিঠির ভিত্তিতে তাঁরা ধর্মঘট তুলে নিচ্ছেন, তা যদি একদিন আগে তাদের দেওয়া হত, তবে আদৌ বাসের চাকা বন্ধ করার দরকার হত না। বস্তুত আলোচনায় বসার যে দাবি রাজ্য সরকার একদিন পরে মানল, তা আগেই মেনে নিলে একদিন সাধারণ মানুষকে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতে হত না।

সংবাদপত্রের একাংশ সরকার বনাম বাসমালিকদের এই টানা পোড়েনকে বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিবহণমন্ত্রীর ঠাণ্ডা লড়াই হিসাবে বর্ণনা করেছে; যে লড়াই হয়েছে যাত্রীসাধারণকে পণবন্দী রেখে। কেউ কেউ সবটাই বাসমালিক ও পরিবহণমন্ত্রীর মধ্যে গড়পেটার খেলা বা 'গট আপ গেম' বলে মনে করেছেন।

কিন্তু বাস ধর্মঘট ও একবেলা কাটতেই তা প্রত্যাহারের পিছনে যে লড়াই-ই থাক এই ধর্মঘট একটা জিনিসকে স্পষ্টত সামনে এনে দিয়েছে। তাহল, বাস মালিকদের ডাকা বন্‌ধ সম্পর্কে সরকার, প্রশাসন এবং একচেটিয়া সংবাদপত্র মালিকদের নরম মনোভাব। মাত্র কয়েকদিন আগে জনসাধারণের ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলনের ধারায়, জনগণের মতামতের ভিত্তিতে আমাদের দলের ডাকা ২১ আগস্ট বাংলা বন্‌ধের বিরুদ্ধে সরকার, প্রশাসন ও প্রচার-মাধ্যম তীব্র আক্রমণ চালায়। ঐ বন্‌ধকে তারা 'কর্মনাশা', 'ছুটির বন্‌ধ' প্রভৃতি নানা আখ্যায় ভূষিত করে। পাশাপাশি বাসমালিকদের ডাকা একদিন নয়, পরপর টানা তিনদিনের ধর্মঘট সম্পর্কে তাদের নরম মনোভাব স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয়, তারা সব ধরনের আন্দোলন, ধর্মঘটের বিরুদ্ধে নয়। তারা একমাত্র জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে। মালিকরা আন্দোলন করলে সরকার তাদের দাবি মেনে নিতে পারে। কিন্তু জনগণ আন্দোলন করলে তাকে তারা পেটায়, এবং লাঠি-গুলি দিয়ে দমন করে। সংবাদমাধ্যম জনগণের ডাকা ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সোচ্চার, কিন্তু মালিকদের ডাকা ধর্মঘটে সম্পূর্ণ নীরব। আসলে সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে ডাকা ধর্মঘট বা বন্‌ধের মধ্যে জনগণের যে সক্রিয় রাজনৈতিক উদ্যোগ থাকে তাকে তারা ভয় পায়। ফলে সেইটে মেরে দেওয়াই মালিকশ্রেণী, তাদের রাষ্ট্র ও প্রচারযন্ত্রের আসল লক্ষ্য।

তাই এটাও দেখা যায় যে, শাসকদল বা ভোটসর্বস্ব বিরোধী দল যখন সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে বন্‌ধ ডাকে তখন মালিকশ্রেণীর স্বার্থের রক্ষক সংবাদপত্র ও প্রচারমাধ্যম তাদের জনস্বার্থবিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধতা বা তাদের সুবিধাবাদী চরিত্রের সমালোচনা ততটা করে না, যতটা বন্‌ধ বিরোধিতা করে। কংগ্রেস, বিজেপি বা সি পি এম, যারাই বন্‌ধ ডাকুক, তাদের রাজনীতিকে সর্বনাশা বলার চেয়ে 'বন্‌ধ কর্মনাশা' — এই প্রচারটাকেই তারা খুব জোর দিয়ে আনে। কারণ তারা জানে সত্যিকারের জনমুখী দল, বিশেষত বিপ্লবী মার্কসবাদী দলের নেতৃত্বে বন্‌ধ জনগণের হাতে অত্যন্ত কার্যকরী হাতিয়ার। তাই বন্‌ধ-এর বিরুদ্ধতা করে, 'বন্‌ধ কর্মনাশা', 'বন্‌ধ করে দাবি আদায় হয় না', 'বন্‌ধ উন্নয়নের পথে বাধা' — নিরন্তর এসব প্রচার করে তারা জনগণকে যেকোন ধরনের আন্দোলন বা বন্‌ধের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে এবং তার দ্বারা জনগণকে নিরস্ত্র করে দিতে চায়।

রাজনীতিতে যেমন মালিকীস্বার্থ, কায়েমী স্বার্থরক্ষাকারী ভোটসর্বস্ব দল এবং তার বিপরীতে জনস্বার্থরক্ষাকারী, গণআন্দোলনের শক্তি বিপ্লবী দল এই দুটো পক্ষ আছে — তেমনি আন্দোলন, বন্‌ধেরও দুটো জাত আছে। আন্দোলনের নেতৃত্ব কোন্ রাজনীতি, কোন্ দল রয়েছে তার উপর নির্ভর করছে বন্‌ধের পরিণাম কী হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে বিচারের প্রশ্নটি আদৌ না তুলে সব ধরনের আন্দোলন বন্‌ধকে এক করে দেখিয়ে প্রচারমাধ্যম জনগণকে বিভ্রান্ত করে। বন্‌ধের পিছনে কোন রাজনীতি কাজ করছে জনগণ তা বিচার করুক, বিচার করে তারা বন্‌ধ সমর্থন করুক বা বিরোধিতা করুক, জনস্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে জনসমর্থনে বন্‌ধ সফল হোক — এটা তারা চায় না। তাই এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধের বিরুদ্ধে তারা অনেক বেশি সোচ্চার।

সকলেই জানেন পরিবহন ধর্মঘট হলে অর্থনীতির সবক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে। কল-কারখানা অফিস-কাছারিতে কাজ হয় না। সরকারি বাস দিয়ে সে ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গে পূরণ করা যায় না, কারণ সরকারি বাস শহর কলকাতা বাদে অন্যত্র অত্যন্ত সীমিত জায়গায় চলে। শহরেও প্রধান পরিবহণ এখন প্রাইভেট বাস। কাজেই অর্থনৈতিক লাভক্ষতির হিসাবে পরিবহন ধর্মঘটের ফলে, ক্ষতি কিছু কম নয়। পরিবহনমন্ত্রী লিখেছেন — "প্রয়োজনহীন এবং অর্থহীন এক ধর্মঘট ডেকে তারা (বাসমালিকরা), জনজীবনকে সন্ত্রস্ত করে আর্থিক ও সামাজিক কাজের ব্যাঘাত ঘটালেন।" (২৮ আগস্ট, গণশক্তি) ঐ লেখাতেই তিনি বলেছেন, বাসমালিকরা "রাজ্য সরকারের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে" ধর্মঘট ঘোষণা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সি পি এম ফ্রন্ট সরকার বাস ধর্মঘট মেনে নিয়েছে, বাস মালিকদের বিরুদ্ধে

ছয়ের পাতায় দেখুন

অযোধ্যা খননকার্য

ভোটের দিনক্ষণ বুঝেই যেন এ এস আই রিপোর্ট দিল

সম্প্রতি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (এ এস আই) বা ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগ অযোধ্যা খনন কার্য সংক্রান্ত রিপোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টে পেশ করেছে। অযোধ্যার যে স্থানে বাবরি মসজিদ ছিল সেস্থানে আগে কী ছিল তা মাটি খুঁড়ে বের করার জন্য যখন পুরাতত্ত্ববিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তখনই প্রশ্ন উঠেছিল এভাবে সত্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে কিনা। কারণ মাটির তলায় বিভিন্ন গভীরতায় ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া স্বাভাবিক। সভ্যতার ক্রমবির্তনের এবং উত্থানপতনের গতিধারায় এক সভ্যতার অবলুপ্তি এবং অন্য সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। এই পটপরিবর্তনের ফলে খনন কার্যের সময় এমন সব উপাদানের সন্ধান মেলা স্বাভাবিক যা থেকে বিভিন্ন সভ্যতার অস্তিত্বের কথা বলা যায়। ফলে মাটি খুঁড়ে সত্য উদ্‌ঘাটন নিয়ে শুরু থেকেই জনমনে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। সন্দেহ দানা বেঁধেছিল শাসকদলের মতলব নিয়েই। কারণ এই খননকার্যের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, যাদের উপর দায়িত্ব ছিল এই খনন কার্য পরিচালনার, তারা বিজেপির আজ্ঞাবহ অনুগামী। ফলে বিজেপির দলীয় স্বার্থসিদ্ধির পরিপূরক রিপোর্টই দেবে এ এস আই, সেদিন মানুষ এমনই আশঙ্কা করেছিল। সে আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত হল। এই রিপোর্টে বলা হল অযোধ্যার বাবরি মসজিদের তলায় মন্দিরই ছিল। আর এই কাজটি করতে গিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে, ভুলভাবে পরিবেশন করে পুরাতত্ত্ববিভাগের নিরপেক্ষতা এবং সম্মানকে যেভাবে ধূলিস্যাৎ করা হয়েছে তার প্রতিবাদে ইতিহাসবিদগণ সোচ্চার হয়েছেন।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক সুরজভান বলেন, এ এস আই-এর রিপোর্ট ভুল তথ্যে ভরা। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ আর সি ঠাকরণ বলেন, এই রিপোর্টে এমন কিছু পাওয়া যায়নি যার দ্বারা মন্দির থাকার সম্ভাবনার কথা বলা যায়। তিনি এও বলেন যে, খননকার্যের সময় কেউ একথা বলেননি যে, প্রাপ্ত প্রমাণগুলি মন্দিরের পরিচয়বাহী। তাহলে কয়েকমাস গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করে রিপোর্টকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে কি যারা দ্বারা বিজেপির নির্বাচনী স্বার্থ পূরণ হবে? দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জয় ভার্মা এই প্রশ্ন তুলেছেন। অধ্যাপক সুরজভান, ইরফান হাবিব প্রমুখ অভিযোগ করেন খননে প্রাপ্ত সব তথ্যই বিচার না করে একপেশেভাবে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। ফলে এর দ্বারা আর যাই হোক সত্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে না।

কিন্তু বিজেপি তো আর সত্যের পূজারী নয়, সত্য উদ্‌ঘাটন তার লক্ষ্যও নয়। তার একটাই মতলব জনমতকে বিভ্রান্ত করে হিন্দু সেন্টিমেন্ট তুলে ভোটে জেতা এবং ক্ষমতার মধুভাণ্ড ভোগ করা। এই দলটির ইতিহাস যাদের জানা, তারা জানেন যে, শুধুমাত্র ভোটে জেতার জন্য এরা কতদূর নীচে নামতে পারে, নিষ্ঠুর পাশবিক আচরণে উন্মত্ত হতে পারে। সম্প্রতি গুজরাট নির্বাচনে তারই ভয়াবহ চিত্র দেখা গেছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক শক্তি ব্যবহার করে ২/৩ মাস ধরে সংগঠিত নরহত্যা করতে পারে যারা, তাদের কাছে সততা, নিষ্ঠা, নৈতিকতা — এসবের কোন মূল্য নেই। তাই এ এস আই-এর রিপোর্ট প্রস্তুতকালে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে বাস্তবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটালেন তারা। ইরাক প্রশ্নে বুশ ব্লেয়ার তথ্যের বিকৃতি এবং ক্রমাগত মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে যেমন অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিলেন তেমন বিজেপি নেতারাও এই বিকৃত রিপোর্ট নিয়ে ইতিমধ্যেই হিন্দু আবেগ তুলতে মাঠে নেমে পড়েছেন। কারণ সামনে লোকসভা নির্বাচন এবং কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ফলে এ এস আই-এর রিপোর্ট বিজেপির কাছে যেন তুরুপের তাস।

এই পরিস্থিতিতে ভেবে দেখা দরকার সুদূর অতীতে অযোধ্যার বিতর্কিতস্থানে মন্দির ছিল না মসজিদ ছিল অথবা জৈনদের দাবিমত জৈন উপাসনালয় ছিল এই বিতর্কের ধূম্রজাল তৈরি করে বর্তমান যুগের সমস্যা মিটবে কি? মাটি খুঁড়ে কি আমরা অতীত যুগে ফিরে যাবো? যারা ইতিহাসের চাকাকে পশ্চাৎমুখী করতে চায় প্রগতির স্বার্থে আজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছেন প্রথিতযশা ইতিহাসবিদেরা, প্রতিবাদ করেছেন পুরাতত্ত্ববিভাগের একাংশ, প্রতিবাদে সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।

ম্যাকিনসে প্রস্তাবের প্রতিলিপি

তিনের পাতার পর

উৎপাদনে কৃষকের খরচ কমানোর ঘোষিত লক্ষ্য(!) বাস্তবায়িত করছে।

এবার, কৃষিপণ্যের দামের কথায় আসা যাক। কীভাবে কৃষকরা কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম পেতে পারেন সে বিষয়েও গৃহীত কৃষিনীতিতে কোন দিকনির্দেশ নেই। শুধু ১২.৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে — "নির্দিষ্টভাবে ধানের ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি রাখতেই হবে যে ন্যায্য সহায়ক মূল্যে রাজ্যের উদ্বৃত্ত ধান-চাল শুধুমাত্র চালকল থেকে নয়, সমবায় ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে কৃষকের স্তর থেকেই সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে, যাতে সাধারণ কৃষক ধানের ন্যায্য দাম পান।" রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করবে, এই হল পরিকল্পনা। নিজেরা কোন দায়িত্ব পালন করবে না।

অবশ্য দায়িত্ব একেবারেই পালন করা হয়নি তা নয়! কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনার নামে এই সরকার কোটি কোটি টাকা চালকল মালিকদের পাইয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ক্যাগের (CAG) রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলাতেই চালকল মালিকদের পাইয়ে দেওয়া হয়েছে ২১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং তার সাথে কুইন্টাল প্রতি ৯ টাকা অতিরিক্ত হিসাবে আরও ১০ কোটি টাকা, মোট ৩১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। এইভাবে রাজ্য সরকার কৃষকদের বঞ্চিত করে চালকল মালিকদের উদারহস্তে সাহায্য করেছে। আর চাষীরা জলের দরে ধান বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হতে বাধ্য হয়েছে — কেউ কেউ আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে।

এবার আসা যাক, খাদ্যনিরাপত্তার বিষয় সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে। এমনভাবে কৃষিনীতিতে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে — যেন এটাই রাজ্য সরকারের প্রধান চিন্তার বিষয়। বলা হয়েছে — "দুটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। শুধু খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন নয়, এই নিরাপত্তাকে বজায় রাখতে হবে।" সরকারের দাবি মতো ২০০১-০২ সালে এ রাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে ১৬৫ লক্ষ টন। এই দশকের শেষে এ রাজ্যে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হবে ১৮৮ লক্ষ টনের মত। অনেকেই ভাবতে পারেন সরকার একদিকে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করবে অন্যদিকে জমির উৎপাদনশীলতা যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। কিন্তু রাজ্য সরকার অন্য ধরনের পরিকল্পনা রচনা করেছে। তাদের পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমি ১৭ লক্ষ হেক্টর কমিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই জমিতে রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করা হবে। কিন্তু তাহলে খাদ্যনিরাপত্তা রক্ষা পাবে কী করে? ওদের বক্তব্য হল জমির উৎপাদনশীলতা হেক্টর প্রতি ২.২ টন থেকে বাড়িয়ে ৩.৪ টন অর্থাৎ দেড়গুণেরও বেশি করতে হবে এবং তাহলেই নাকি খাদ্যনিরাপত্তা বজায় থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, জমির উৎপাদনশীলতা কি দ্রুত দেড়গুণ বাড়িয়ে ফেলা সম্ভব? সরকারের হিসাবমতে, এই রাজ্যে ৮৯ শতাংশ কৃষি জমি উন্নত বীজে চাষ হয়, এবং এখানে সার ব্যবহারও সর্বভারতীয় গড়ের চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি, বছরে হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৪৫ কিগ্রা। ফলে এখানে বড়জোর আরও ১১ শতাংশ জমিতে উন্নত বীজে চাষ করা এবং সারও হয়তো আরও দু-চার কেজি বেশি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু তাতেই রাজ্যব্যাপী খাদ্যশস্যের উৎপাদন দেড়গুণ বেড়ে যাবে — এই সিদ্ধান্ত শিশুসুলভ। যে সরকার সত্যিই খাদ্যনিরাপত্তা বজায় রাখার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে তারা এই ধরনের পরিকল্পনা রচনা করতে পারে কি? বরং পরিকল্পনা রচনার ভঙ্গি দেখে কি এটাই মনে হয় না যে, সরকার রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের উপরই বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে। না হলে খাদ্যনিরাপত্তার প্রশ্নটিকে বিপন্ন করে তারা বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদনের দিকে উন্মত্তের মত ঝুঁকবে কেন? তাছাড়া তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় বেশি সার প্রয়োগ করলেই উৎপাদন দেড়গুণ হয়ে যাবে — তাহলেও, তা কি এ রাজ্যের ঋণজর্জরিত সাধারণ কৃষকের পক্ষে সম্ভব? একেই তো এ রাজ্যে সেচের খরচ বেড়েছে ১৭৪.৭৭ শতাংশ, কীটনাশকের দাম বেড়েছে ৭৮.০১ শতাংশ, রাসায়নিক সারের পিছনে খরচ বেড়েছে ৭৮.৩৬ শতাংশ এবং তা জোগাড় করতেই চাষী হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে — তার উপর আবার বর্ধিত এই খরচ চাষী বহন করতে পারবে তো? উত্তরটা আমাদের সবারই জানা। না। তাহলে বেশি সার ছিটিয়ে উৎপাদন দেড়গুণ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা যে মাঠে মারা যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং একথা রাজ্যের শাসকবর্গ জানেন না তা নয়।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি মজুরের অবস্থা যে ভয়াবহ এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯৯১-২০০১, এই দশ বছরে এ রাজ্যে ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২৩ লক্ষ। এর ফলে, এই প্রথম রাজ্যে সেই কৃষিকর্মীর মধ্যে ভূমিহীন খেতমজুরের হার অর্ধেকেরও বেশি ৫৬.০৭ শতাংশ; সংখ্যায় ৭৫ লক্ষের কাছাকাছি হয়েছে। এই মজুরেরা সরকারি আইন অনুযায়ী প্রাপ্য মজুরি থেকেও বঞ্চিত এবং বছরে তারা কাজ পায় গড়ে ১১৪ দিন। অর্থাৎ বছরে প্রায় ৮ মাসই তারা বেকার থাকতে বাধ্য হন। ফলে কিভাবে এই বিপুল গ্রামীণ বেকার বাহিনীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। কিন্তু রাজ্য সরকার কৃষিনীতিতে উন্নয়নের যে মডেল গ্রহণ করেছে তাতে গ্রামীণ খেতমজুরের নতুন কর্মসংস্থান তো দূরের কথা, যতটুকু কাজ এখনও মিলছে তাও চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। গৃহীত পরিকল্পনায় আমরা লক্ষ্য করেছি, এ রাজ্যে ১৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষের জায়গায় অন্যান্য অর্থকরী ফসল ফলাবার পরিকল্পনা চলছে। গ্রামের শ্রমের বাজারে এর ফল কি দাঁড়াবে?

ধান চাষ চরিত্রে শ্রমনিবিড়। ধানের বীজতলা তৈরি, জমি তৈরি, রোয়া, নিড়ানো, কাটা-ঝাড়া-বাঁধাই ইত্যাদি এই চাষের প্রতিটি পর্যায়েই শ্রমিকের প্রয়োজন এবং তা সংখ্যায় কম নয়। আবার সেচ এলাকায় বছরে দু'বার ধান চাষ তো হতেই পারে। ধান চাষ বন্ধ করে সেই জমিতে কলা চাষ করলে শ্রমিকের প্রয়োজন হবে দশভাগের এক ভাগ। তাই সহজেই বলা যায় ১৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধানচাষ বন্ধ করে সেখানে রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক ফসল চাষ করলে আর যারই হোক গ্রামীণ কৃষিমজুরদের সমস্যার কোন সুরাহা হবে না বরং তাদের সমূহ সর্বনাশ হবে। কারণ, তাঁরা কাজ হারাবেন ব্যাপক হারে। ফলে লক্ষ্য হিসাবে গ্রামীণ মজুরের কর্মসংস্থানের কথা বললেও যে পরিকল্পনা ওরা রচনা করছে তাতে কর্মসংকোচনই ঘটবে — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অর্থাৎ আমরা দেখছি মুখে খাদ্য সুরক্ষা, গ্রামীণ শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কাজের ব্যবস্থা, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম বা ফসলের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস প্রভৃতির কথা বললেও আসলে রাজ্য সরকারের গৃহীত কৃষিনীতিতে এর বিপরীত পরিকল্পনাই করা হয়েছে। গৃহীত এই নীতিতে খেতমজুর কাজ হারাবে, ফসলের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে, খাদ্যে রাজ্যের স্বয়ম্ভরতা বিপন্ন হবে, চাষীর ফসলের দাম পাবার কোন ব্যবস্থা করা হবে না অর্থাৎ কৃষিনীতির লক্ষ্য বলে ঢাকঢোল পিটিয়ে যা ওরা প্রচার করছে তার কোনটাই বাস্তবায়িত হবে না। তাহলে এই কৃষিনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

আমরা আগেই বলেছি, রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পুঁজির অবাধ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতেই রাজ্য সরকার নয়া এই কৃষিনীতি গ্রহণে উদ্যোগ নিয়েছে। কৃষিনীতির বিকল্প খসড়া নিয়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে তখনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন — "কৃষিশিল্প দপ্তর ম্যাকিনসের সুপারিশ রূপায়ণ করবে" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪-১-০৩)। কিন্তু বিভিন্ন মহলে এই বক্তব্যের বিরোধিতা লক্ষ্য করে রাজ্য সরকার ম্যাকিনসের সুপারিশের সারাংশ গ্রহণ করে তার সাথে ভাষার চাতুরী মিশিয়ে নয়া কৃষিনীতি রচনা করেছে। এই নীতির এক জায়গায় বলা হয়েছে (অনুঃ ১১.২) — "শিল্পস্থাপনের জন্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী স্মরণসভা

আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর প্রয়াত বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর স্মরণসভা ১৭ আগস্ট '০৩ তারিখে পাটনার আই এম এ হলে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের প্রতিটি কোণা থেকে শোকাহত পার্টি কর্মী-সমর্থক-দরদীরা কমরেড চক্রবর্তীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দলে দলে এই সভায় উপস্থিত হন। বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা ও বিশিষ্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাও শ্রদ্ধা জানাতে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন পার্টির উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভি এন সিং। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিহার রাজ্য কমিটির বর্তমান সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর।

সভার প্রথমে দলের রাজ্য শাখা, বিভিন্ন জেলা শাখা ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা, দলের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক, বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতা ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড রণজিৎ ধর। এরপর কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর মৃত্যুতে পার্টির প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রেরিত শ্রদ্ধার্ঘ পড়ে শোনান দলের বিহার রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড অরুণ সিং। প্রয়াত কমরেড চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আর এস পি'র বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড তারাকান্ত প্রসাদ বলেন, 'কমরেড চক্রবর্তীর সাথে আমার সম্পর্ক শুধু একজন বামপন্থী নেতা হিসাবেই নয়, তার থেকেও বড় সম্পর্ক ছিল। আগামী দিনের যুক্ত বামপন্থী আন্দোলনে তাঁর কথা আমাদের মনে পড়বে।' সি পি আই'র বিহার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বিশুন দেব প্রসাদ ও কমরেড ইউ এন মিশ্র বলেন, 'তাঁর সাথে যখন মিটিং-এ বসতাম, দেখতাম যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সাথে শান্তভাবে তিনি নিজের বক্তব্য রাখতেন। দৃঢ় চরিত্রবান হওয়াটাই তাঁর জীবন থেকে সত্যিকারের শিক্ষা নেওয়ার বিষয়।' সি পি আই (এম)-এর বিহার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কৃষ্ণকান্ত সিংহ ও কমরেড চণ্ডীপ্রসাদ বলেন, বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলনে কমরেড চক্রবর্তীর অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হবে। সি পি আই-এম-এল (লিবারেশন)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে ডি যাদবও কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের বিহার শাখার সচিব এবং বিহার মাধ্যমিক পরীক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক ও পি জয়সোয়াল বলেন, 'সভার পরিবেশ খুবই হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক। আমি এমন একজন মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে এসেছি যিনি সারা জীবন গরিব এবং শ্রমিক-চাষীদের শোষণমুক্তির জন্য নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন।' প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ পি গুপ্ত বলেন, 'আমি সি পি আই'র সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাথে যেকোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কোন আড়ষ্টতা অনুভব করিনি। তিনি নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কোন সময় কিছু বলতেন না, কিন্তু তাঁর দলের কোন কর্মীর অসুস্থতার সংবাদ পেলেই আমাকে ফোন করতেন।' বি এন কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রেমচাঁদ-শরৎচন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির সহ-সভাপতি অধ্যাপক পূর্ণেন্দু মুখার্জী বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক যে, আজ কমরেড চক্রবর্তীর স্মরণসভায় আমাকে আসতে হল। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু মনের দিক থেকে ছিলেন সংগ্রামী। তাঁর দৃঢ় চরিত্র এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ওপর তাঁর আলোচনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েই আমি প্রেমচাঁদ-শরৎচন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটিতে যুক্ত হই। ওঁর সংগ্রামকে শক্তিশালী করাই হবে ওঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দলের কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, আজকের এই স্মরণসভায় উপস্থিত বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতা ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে, কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী একজন বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা ও মহান চরিত্রের বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর এই চরিত্র একটা বিশেষ সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল। কমরেড চক্রবর্তীকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে হলে এই সংগ্রামকে আমাদের জানতে হবে। কমরেড ধর বলেন, মহান মার্কসবাদী নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ মুষ্টিমেয় কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে এদেশে একটি সঠিক সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের কাজ শুরু করেন। ভারতবর্ষের মত একটি বিশাল দেশে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব কর্তৃক স্বীকৃত কমিউনিস্ট পার্টি নামে একটি পার্টি থাকা সত্ত্বেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে একটি নতুন দল গঠন করা খুবই কঠিন ছিল, বিশেষতঃ পরিচয়ও সম্পূর্ণ সহায়সম্বলহীন মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুবকের পক্ষে। গভীর সত্যনিষ্ঠা ও উন্নত সংস্কৃতিগত মান ছাড়া কারোর পক্ষেই তখন এই প্রয়াসের সাথে নিজেকে যুক্ত করা সম্ভব ছিল না। কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী দল গঠনের সেই সূচনাপর্বেই কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং এই প্রক্রিয়ার সাথে নিজেকে যুক্ত করেন।

১৯৪৮ সালে প্রথম কনভেনশনের মধ্য দিয়ে দলের সাংগঠনিক কাঠামো দেবার আগে যাঁরা এই নতুন দল গঠনে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের নিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে প্রথমে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ এক তীব্র

সাতের পাতায় দেখুন

স্মরণসভায় (বাঁদিক থেকে) কমরেডস্ তারাকান্ত প্রসাদ, শিবশঙ্কর, অরুণ সিং, রণজিৎ ধর, ভি এন সিং

কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী স্মরণে কমরেড নীহার মুখার্জীর শ্রদ্ধার্ঘ

আমাদের দলের বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও সেন্ট্রাল স্টাফ কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী গত ৩ আগস্ট ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যাণ্ড হসপিটালে, ৭৫ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর জীবনাবসানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল, বিহার রাজ্য পার্টির সকল নেতা ও কর্মীদের সম্মিলিত ও একনিষ্ঠ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একমাত্র তা পূরণ করা সম্ভব।

এস ইউ সি আই-এর সক্রিয় কর্মীরূপে কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীর জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালে যখন তিনি যুবক। আমাদের দেশের বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন সম্পর্কে জানার এক গভীর আগ্রহ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এটা ঐ বয়সের সকলের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর চরিত্রের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তাঁকে ঐ বয়সেই একটা বিশিষ্টতা দিয়েছিল। তা হচ্ছে, যে কাজ করাটা তিনি ন্যায্য ও সঠিক মনে করতেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্তে তাকে কার্যকরী করতে চেষ্টা করতেন এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত সেই কাজ থেকে তাকে কেউ বিরত করতে পারত না। একথা সহজেই বোঝা যায়, ঐ বয়সেই অর্জিত এইসব চারিত্রিক গুণাবলী ছাড়াও, কী গভীর মনোবল, সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং বিপ্লবী আদর্শের প্রতি অটল আনুগত্য থাকলে, সে সময় দলকে যে অবর্ণনীয় কষ্ট, দারিদ্র্য ও অনাহারের মধ্যে চলতে কমরেডরা দেখেছেন তার মধ্যেও তিনি স্বেচ্ছায় পার্টির সক্রিয় কর্মী হতে এগিয়ে এসেছেন এবং কর্তব্য পালনে অবিচল থেকেছেন। প্রথম যে সক্রিয় কর্মীবাহিনীকে কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজের প্রত্যক্ষ যত্ন ও তত্ত্বাবধানে তৈরি করেছিলেন, কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী ছিলেন তাঁদেরই একজন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই বিপ্লবী যোদ্ধার ভিতরে ছিল একটা শান্ত-সংযত ও রসিক মন — যা উৎকণ্ঠাজনক ও প্ররোচনামূলক পরিস্থিতিতেও সকৌতুক আলাপচারিতায় পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে রাখতে পারত।

তাঁর চরিত্রের এই গুণাবলী কমরেড শিবদাস ঘোষের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি শীঘ্রই তাঁকে তৎকালীন বিহার রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড হীরেন সরকারকে সংগঠনের কাজে সহায়তা করার জন্য ঘাটশিলায় পাঠান। কমরেড হীরেন সরকার দীর্ঘকাল ঘাটশিলাকে কেন্দ্র করে বিহারে কাজ করছিলেন। কমরেড সরকারের নেতৃত্বে কমরেড চক্রবর্তী জামশেদপুর, নরসিংগড়, বহড়াগোড়া, মোসাবনি, পটকা, পটমদা, রাঁচি, চাইবাসা প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রয়াসী হন। তিনি এতদঞ্চলে কেবল শ্রমিক, ছাত্র, যুবক ও চাষীদের সংগঠনই গড়ে তুলেছেন তাই নয়, এই অঞ্চলের অত্যাচারিত আদিবাসী জনগণের মধ্যেও পার্টি ও গণসংগঠন গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে পার্টি তাঁকে মুঙ্গের ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় রেলশ্রমিকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দেয়। তিনি জামালপুরকে কেন্দ্র করে এই দায়িত্ব পালন করেন। বিহার রাজ্য পার্টি ও গণসংগঠনগুলির সুদৃঢ় অগ্রগতির পিছনে কমরেড চক্রবর্তীর নিরলস ও নিরন্তর প্রয়াসের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭৪ সালে ঐতিহাসিক রেলধর্মঘটের সময়ে ও আরও বহুবার তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন।

তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সরল। ছোটখাট কষ্ট-অসুবিধা তো দূরের কথা, এমনকি গুরুতর কষ্টের মধ্যে পড়লেও কখনও কোন বিষয়ে তাঁর অভিযোগ ছিল না, যা আমাদের সকলের কাছে শিক্ষণীয়। পার্টির প্রয়োজন ছাড়া আলাদা করে তাঁর নিজস্ব কোনও প্রয়োজনবোধ ছিলনা। শারীরিক কষ্টের সাথে সাথে সংগঠনের ক্ষেত্রে নানা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকেও তিনি প্রায়শঃই যে প্রাণোচ্ছলতা, বিরল স্থৈর্য ও সরসতার সাথে সহ্য করেছেন, চরিত্রের সেই গভীরতা উপলব্ধি করা সাধারণ কর্মীদের পক্ষে খুবই কঠিন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বয়সের কমরেডদের সাথে হাসি-ঠাট্টা-কৌতুকের মধ্য দিয়ে মিশতে পারা এবং এভাবে তাদের মনকে ভারমুক্ত হতে সাহায্য করা ও পার্টির অভ্যন্তরে একটা খোলামেলা প্রাণবন্ত পরিবেশ জীবন্ত রাখার একজন নেতার যে চরিত্রগুণ, কমরেড চক্রবর্তী প্রায় নিখুঁতভাবে সেই গুণ আয়ত্ত করেছিলেন। তাই এমনকি যাঁদের সঙ্গে কোনও কোনও বিষয়ে তাঁর মতবিরোধও হত, তাঁদের সাথেও তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ও খোলা মনে, কোনও অসুবিধা ছাড়াই একত্রে কাজ করতে পারতেন। কখনই নিজের তথাকথিত অনুভূতি বা মানসিক অবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে কোনও বিষয়ে মতপার্থক্যকে তিনি তিক্ততায় পর্যবসিত হতে দিতেন না। ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া থেকে কখনও কাউকে আঘাত তো তিনি দিতেনই না, যেটা কমিউনিস্টদের পক্ষে অনৈতিক ও অকল্পনীয় আচরণ, বরং অন্যের থেকে আঘাত পেয়েও, তা পার্টি স্বার্থে ও যৌথ কর্মপ্রক্রিয়ার মানসিকতা থেকে উদারহৃদয়ে ও হাসিমুখে সহ্য করেছেন। এমনই ছিলেন কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী — কমরেড শিবদাস ঘোষের একজন অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র। তাঁর জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ড এবং সর্বোপরি নীতিনৈতিকতার যে উচ্চমান তিনি অর্জন করেছিলেন, সেটাই প্রমাণ যে, তিনি যথার্থই সর্বহারাশ্রেণী, বিপ্লব ও দলের স্বার্থের কাছে নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে সমর্পণ করতে পেরেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিহার রাজ্য দলের অভ্যন্তরে ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে গড়ে উঠেছিলেন এবং

সাতের পাতায় দেখুন

ম্যাকিনসে প্রস্তাবের প্রতিলিপি

চারের পাতার পর

জেলা স্তরে উৎসাহ দেওয়া হবে উন্নত প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিংকে গুরুত্ব দিয়ে ফুড পার্ক স্থাপন করতে। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে আহবান জানানো হচ্ছে বেসরকারি উদ্যোগীদেরও এবং কয়েকটি জেলাতে স্থানীয় উদ্যোগীরা এগিয়ে এসে এই কাজ শুরুও করেছেন।" সরকারি উদ্যোগ না হয় বোঝা গেল — কিন্তু বেসরকারি উদ্যোগী কারা? এরা হল র‍্যালিজ, (টাটা), এইচ এল এল, কারগিল, ডাবর, পেপসি, আই টি সি ইত্যাদি দেশি-বিদেশি বহুজাতিক পুঁজিপতি সংস্থা। রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে এরাই এখন রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে পছন্দমতো পণ্য উৎপাদনের ফরমাস দিচ্ছে এবং সেই কাঁচামাল দিয়ে তারা দেশি-বিদেশি বাজারে সরবরাহের জন্য পণ্য তৈরি করে লাভের পাহাড় ঘরে তুলবে। তাদের এই স্বার্থ ও চাহিদাকে পূরণ করতেই রাজ্য সরকার নতুন কৃষিনীতি গ্রহণ করেছে এবং তাকেই উন্নয়নমুখী ও জনমুখী নীতি বলে চালানোর চেষ্টা করছে।

রাজ্য সরকার গৃহীত কৃষিনীতি ও ম্যাকিনসের সুপারিশের মধ্যে সাদৃশ্য অবাক করার মত। সাদৃশ্য এরকম —

(ক) ম্যাকিনসের সুপারিশে বলা হয়েছিল — এতদিন ধরে এই রাজ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের উপর জোর দেওয়ার যে নীতি অনুসৃত হচ্ছিল তার পরিবর্তন করতে হবে; শাকসবজি, ফল-ফুল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য নয় এমন উৎপাদনের উপর জোর দিতে হবে। রাজ্য সরকার হুবহু এই নীতি অনুসরণ করেছে।

(খ) ম্যাকিনসের সুপারিশে ধানচাষের জমি ১৩ লক্ষ হেক্টর কমিয়ে সেখানে বাণিজ্যিক চাষের কথা বলা হয়েছিল। রাজ্য সরকার আরও এক ধাপ এগিয়ে তা ১৭ লক্ষ হেক্টর করার চেষ্টা করছে।

(গ) সুপারিশে বলা হয়েছিল বাণিজ্যিক ফসল ফলানো ও বিপননের জন্য বিশেষ জোন তৈরি করতে হবে। রাজ্য সরকার তৎপরতার সাথে ইতিমধ্যেই পাঁচটি বিশেষ জোন তৈরি করে ফেলেছে।

ম্যাকিনসের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল চুক্তি চাষ প্রথা। সুপারিশে চুক্তি চাষ প্রথার অনুকূলে ওকালতি করে ম্যাকিনসে বলেছিল — ''With the increase in labour cost these companies are moving away from managing captive farms to model like contract farming where they work closely with independent farmers." অর্থাৎ মজুরি খাতে খরচ বেড়ে যাওয়ার জন্য বহুজাতিক পুঁজির মালিকরা বড় বড় খামার তৈরির পথ থেকে ক্রমশই চুক্তি চাষের দিকে সরে যেতে চাইছে। বহুজাতিক পুঁজির এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়ে ম্যাকিনসেও রাজ্যে চুক্তি চাষ প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করে। কিন্তু এই সুপারিশ তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ফলে দেখা যায়, রাজ্য সরকারের কৃষিনীতির কোন খসড়াতেই এই চুক্তি চাষ প্রথার উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি গৃহীত নীতির কোথাও চুক্তি চাষের কথা রাখা হয়নি। এ দেখে যদি কেউ মনে করেন রাজ্য সরকার চুক্তি চাষ প্রথার বিরোধিতা করছে বা ম্যাকিনসের এই সুপারিশকে বাতিল করে দিয়েছে তবে তা ভুল হবে। সরকার এই পরিকল্পনা আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে তা অবশ্য প্রকাশও হয়ে পড়ছে। গত ১৬ জুন রাজ্য মৎস্যদপ্তরের সচিব জানিয়েছেন — "সরকার চুক্তি চাষ প্রথা বাতিল করেনি। এই প্রথা রাজ্যে নতুনও নয়। মাছ চাষের ক্ষেত্রে রাজ্যের নানা জায়গায় এবং আখচাষেও এটা কার্যকর রয়েছে। এই প্রথা আরও বিস্তৃত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা চালাচ্ছে এবং তাতে সাফল্যও পাওয়া যাচ্ছে। (আনন্দবাজার ১৬-৬-০৩)। এই চুক্তিচাষের কি বিষময় ফল ফলছে, তা আমরা আগেই গণদাবীর পাতায় আলোচনা করে দেখিয়েছি। আমরা দেখিয়েছি — দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা বা মেদিনীপুর জেলার যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চুক্তিতে জমি লিজে দিয়ে ভেড়ি তৈরি করে মাছ চাষের প্রথা চালু হয়েছে তাতে সাধারণ চাষী জমি হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হচ্ছেন। যেহেতু চুক্তি চাষে ফসলের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কৃষকের থাকতে পারে না, তাই অগ্রিম দেওয়ার নামে বৃহৎ পুঁজি ছোট চাষীকে ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে ফেলবে, তাদের ইচ্ছামত শর্তে চাষীকে ফসল বেচতে বাধ্য করবে এবং প্রয়োজনে শাসকদল প্রশাসনের সহায়তায় চাষীর কাছ থেকে জোর করে ফসল কেড়ে নেবে। ঠিক এই ঘটনাটাই আমরা দেখতে পেয়েছি চিনিকল মালিকদের সাথে আখচাষীদের চুক্তির ক্ষেত্রে।

রাজ্য সরকার, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী এমন একটা ধারণা প্রচার করছেন যেন আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক ফসল তৈরি করতে পারলেই বাংলার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ঘটবে। এমনভাবে ওরা বিষয়টিকে উত্থাপন করছেন যেন এটাই একমাত্র সর্বরোগহর দাওয়াই। কিন্তু বিষয়টা কি সত্যিই এরকম? কী অভিজ্ঞতা আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের? মেক্সিকো, হণ্ডুরাস, ভেনেজুয়েলা, আর্জেন্টিনা, সুদান বা মরক্কোর অবস্থা তো একইকথায় ভয়াবহ। লক্ষ লক্ষ ছোট কৃষক সেখানে সর্বস্ব হারিয়েছে। লক্ষ লক্ষ একর জমি বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। হণ্ডুরাসের অর্ধেক বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে। মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সর্বগ্রাসী মুনাফা শিকারের পরিণাম সম্পর্কে এক রিপোর্টে বলা হয়েছে — ''Workers live in misery. …The multinational corporations that for years have profited from banana production have discharged thousands of workers. Today, plantations were filled with unemployed workers who have almost no social assistance''. (Annual Report on Workers' Rights, Agricultural workers, 2001) 'উন্নয়নের' এই নকশা ও পরিণতি বুদ্ধবাবুদের অজানা নয়। শুধু বিদেশেই নয়, এদেশের অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট, রাজস্থানে রেপসিড, সয়াবিন, সূর্যমুখী, তৈলবীজ ইত্যাদি কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। গমের জায়গায় টমাটো, ধানের জায়গায় ফুলচাষ প্রাধান্য পাচ্ছে। কেরালার বনাঞ্চল ও ধানজমির একটা বড় অংশকে রবার, কফি ও নারকেল বাগিচায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এর ফল হয়েছে ভয়াবহ। শুধু কর্ণাটকেই ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ পর্যন্ত ১০,৯৫৯ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। এই আত্মহত্যার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, ''The village as an institution has crumbled under the pressure of commercialisation'' (EPW. 29.6.02)। অর্থাৎ বাণিজ্যিকীকরণের চাপে গ্রামীণ সমাজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। পাঞ্জাব অন্ধ্রেও একই অবস্থা। সেখানেও চাষীদের আত্মহত্যার মিছিল। এখন এই নীতিই এ রাজ্যে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

কৃষিনীতিতে রাজ্য সরকার উন্নত বীজ ব্যবহারের কথা বেশ গর্বের সাথেই বলেছে। ৭.১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে — "কৃষিতে উৎপাদনবৃদ্ধির অন্যতম উপাদান উন্নতমানের বীজ। ....এরাজ্যের উন্নত বীজের প্রয়োজন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ভিত্তিতেই পূরণ করতে হবে।" অথচ বছরের পর বছর কার্যত এই সরকার কী করেছে? পরিকল্পিতভাবে এরা রাজ্য বীজ নিগমকে পঙ্গু করে ফেলেছে। রাজ্য বীজ নিগমের এখন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলির কাছ থেকে বীজ কিনে তা সরকারি এজেন্সির মারফৎ সরবরাহ করা। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় রাজ্য বীজ নিগমের অধীনে সরকারি কৃষি খামার রয়েছে। চুঁচুড়ায় ও হাবড়ায় রয়েছে ধান গবেষণা কেন্দ্র। বেথুয়াডহরীতে আখ গবেষণা কেন্দ্র, বহরমপুরে ডাল ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, কৃষ্ণনগরে সবজি ও উদ্যান গবেষণা কেন্দ্র। কিন্তু এগুলির উপযুক্ত ব্যবহার নেই। এগুলিকে বহুলাংশে ফেলে রাখা হয়েছে। এবং এখন এইসব খামারকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে এই ধরনের একটি খামারের ১৫০ বিঘা জমি BIJU নামে একটা বেসরকারি বীজ উৎপাদক সংস্থাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় বীজ উৎপাদক ও শিল্প সংস্থাগুলিও এখন এই খামারগুলিকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। অধিক বীজ উৎপাদনের কথা বলে — রাজ্য সরকারও এই খামারগুলিকে শিল্পসংস্থার হাতে তুলে দেবার পরিকল্পনা রচনা করেছে। যে ভূমি সংস্কার কর্মসূচি এবং 'অপারেশন বর্গা'র সাফল্য বামফ্রন্ট জোর গলায় প্রচার করে, আমরা দেখিয়েছি তাতে গরিব চাষী খেতমজুরের বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। বড় জোতদার, কৃষিপণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের মুনাফা বেড়েছে। কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদ আরও পাকাপোক্ত হয়েছে; আধুনিক সার, বীজ, কীটনাশক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যতটা কৃষি উৎপাদন বেড়েছে তা কেনার ক্ষমতা মানুষের নেই। তাই ভুখা মানুষের দেশে সরকার বলছে ধান, চাল, গম নয়, এমন ফসল ফলাও যা গরিব মানুষ কিনবে না, কিনবে বড় বড় খাদ্যব্যবসায়ী শিল্পপুঁজির মালিক। এই হল তাদের 'ভূমিসংস্কার' কর্মসূচির অনিবার্য পরিণতি। তারা ভূমি সংস্কার চাষী খেতমজুরের স্বার্থে করেনি, করেছে কৃষি পুঁজিপতিদের স্বার্থে। সেই কৃষি পুঁজিপতিরাই এখন বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চাইছে ক্ষুদ্র জোতের বদলে বৃহৎ জোত, তা সমবায় বা অন্য যে নামের আড়ালেই হোক। তারা চাইছে, সস্তায় সেইসব কৃষিপণ্য যা কারখানায় তারা কাঁচা মাল হিসাবে কাজে লাগিয়ে মুনাফা লুটবে। বামফ্রন্টের নয়া কৃষিনীতিকে ওপর থেকে দেখলে মনে হতে পারে যে 'ভূমিসংস্কারের' পথ থেকে সরে তারা উল্টো পথে যাচ্ছে। আসলে তা নয়। সেদিনও তারা যা করেছে, তা করেছে পুঁজিপতিদের স্বার্থে, এখনও সেই স্বার্থই তারা দেখছে।

তাই সবদিক বিবেচনা করে দেখলে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না — শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যেমন দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থরক্ষকের ভূমিকা পালন করে গরিব সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করছে — নয়া কৃষিনীতিও তার ব্যতিক্রম নয়। এই নীতিও গরিব কৃষক-খেতমজুরদের সর্বনাশ করবে। তাই সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের চাপে এই নীতিকে পরাস্ত করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

বাস মালিকদের ধর্মঘট প্রসঙ্গে

তিনের পাতার পর

কোন পদক্ষেপ নেওয়া দূরে থাক, তাদের দাবি মেনে নিয়েছে। অথচ জনস্বার্থে বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে ফি ও চার্জ বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবি তারা মেনে নেয়নি। এ নিয়ে আলোচনা দূরে থাক, বন্‌ধের দিন তারা বন্‌ধের সমর্থনে মিছিল পর্যন্ত করতে দেয়নি। পুলিশ, র‍্যাফ নামিয়ে রাজ্যে অঘোষিত কার্ফু জারি করে কয়েকজন এস ইউ সি আই কর্মী একত্রিত হলেই তাদের গ্রেপ্তার করেছে, লাঠিপেটা করেছে, রাজ্যে ১৩৭৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। অথচ বাস মালিকদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে পরিবহণমন্ত্রী যে বলেছিলেন, ধর্মঘট করলে বাস মালিকদের বাস কেড়ে নিয়ে চালানো হবে, তা তো অর্থহীন প্রমাণ হলই, উপরন্তু বাস না চালিয়ে সরকারি নির্দেশ অমান্যের জন্য গ্রেপ্তার তো দূরের কথা, মালিকদের বিরুদ্ধে তারা মামলা পর্যন্ত করেনি। এ থেকেই প্রমাণ হয় এই সরকার কাদের সরকার? প্রমাণ হয়, সি পি এম ফ্রন্ট সরকার জনগণের সরকার নয়, এটি বাস মালিক, ঠিকাদার, ধনী ও একচেটিয়া মালিকদের সরকার। প্রচারমাধ্যমগুলিও এদেরই স্বার্থরক্ষক।

এই বাস ধর্মঘট আর একটি জিনিসও প্রমাণ করে দিয়ে গেল, তা হল, বাসমালিকদের সাথে সরকারের গভীর সম্পর্ক ছাড়াও বাসমালিকরা সরকারকে দিয়ে তাদের দাবি যে মানিয়ে নিতে পারল তার আর একটা কারণ, বাসমালিকরা সংগঠিত। যখনই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শক্তি সংগঠিত হয়, তাকে উপেক্ষা করা যে কোন সরকারের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়ে। জনগণ তেমন উপযুক্তভাবে সংগঠিত নয় বলেই সরকার জনগণের দাবিকে বারবার উপেক্ষা করতে পারে। তাছাড়া এও মনে রাখা দরকার, মালিকদের দাবি মানতে এই সরকার যত তৎপর, জনগণের দাবি মানার ক্ষেত্রে তার মনোভাব ঠিক উল্টো। আন্দোলনের চাপে বাধ্য না করতে পারলে তাকে দিয়ে জনগণের দাবি মানানো সম্ভব নয়, উনিশ বছর সংগ্রাম করে প্রাথমিকে ইংরাজি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছিল। আন্দোলনের চাপেই হাসপাতালের চার্জ, স্কুল-কলেজের বর্ধিত বেতন খানিকটা কমানো সম্ভব হয়েছে। নিতান্ত বাধ্য না করতে পারলে সরকার জনগণের দাবি মানবে না। তাই জনগণকে আরও সংগঠিত, উদ্যোগী ও সক্রিয় হতে হবে। লাগাতার যে আন্দোলন এস ইউ সি আই চালাচ্ছে সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা তাকে দুর্বার করতে হবে শুধু নয়, এর মধ্য দিয়ে এমন সংগঠিত জনশক্তির জন্ম দিতে হবে যাকে উপেক্ষা করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব না হয়।

কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী স্মরণসভা

পাঁচের পাতার পর

সমাজতান্ত্রিক মতবাদিক সংগ্রাম শুরু করেন। কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী দল গঠনের প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক এই সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে নিজেকে একজন যোগ্য কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। কমরেড ধর বলেন, সোভিয়েট এবং চীন বিপ্লবের সময়ে একজন ভাল কমিউনিস্ট হিসাবে তিনি বিবেচিত হতেন, যিনি ব্যক্তি প্রয়োজনকে শ্রেণী, দল ও বিপ্লবের কাছে গৌণ করতে পারেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, বর্তমান চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের যুগে কমিউনিস্ট হওয়ার সংগ্রামে এটা হচ্ছে শুরু। এই যুগে উন্নত কমিউনিস্টের মান অর্জন করতে হলে শ্রেণী, দল ও বিপ্লবের সাথে নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে। এই সংগ্রামে কমরেড চক্রবর্তী অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। কমরেড চক্রবর্তী খুব ভাল বক্তা ছিলেন না, তত্ত্বগত আলোচনাও কম করতেন, কিন্তু আদর্শের প্রতি তাঁর অবিচল প্রত্যয়, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও উন্নত সংস্কৃতিগত মান সকলের, এমনকি উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের ওপরেও গভীর ছাপ ফেলেছে। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন এবং অপরকে যা বলতেন, যা বোঝাতেন, নিজের জীবনেও তা প্রয়োগ করতেন।

কমরেড ধর বলেন, অতীতেও আমাদের দেশে চাষী-মজুর-শোষিতের অনেক সংগ্রাম হয়েছে, অনেক কোরবানী হয়েছে। কিন্তু আমরা এক কদমও এগোতে পারিনি, বরঞ্চ প্রতিক্রিয়াবাদীরাই শক্তিশালী হয়েছে। এর কারণ, কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, যদি শুধু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে, যদি তার পেছনে সঠিক আদর্শ না থাকে এবং উচ্চসংস্কৃতির আধারে তা গড়ে তোলা না যায়, তবে তা বেশি দূর এগোতে পারেনা। এইজন্য তিনি উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রামের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি বলতেন, রাজনীতি একটা উচ্চ হৃদয়বৃত্তি, বিপ্লবী রাজনীতি তো আরও উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। আমরা আজ আন্দোলনের মধ্যে আছি এবং যতদিন সমাজে শোষণ-নির্যাতন থাকবে এই আন্দোলন চলতে থাকবে। কারণ আন্দোলন ছাড়া শোষিত মানুষের বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই। এই আন্দোলনগুলোকে যদি আমরা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চাই তবে তা উন্নত আদর্শ ও সংস্কৃতির ওপর গড়ে তুলতে হবে। যারা এই সমাজকে পাল্টাবে তাদের উন্নত রুচি নীতিনৈতিকতার আধারে সংগ্রাম চালিয়ে আগে নিজেদের পাল্টাতে হবে।

কমরেড ধর বলেন, কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে দলের এই বিশেষ সংগ্রামটিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের বিশেষ করে জানতে হবে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ও জীবন সংগ্রামকে — যাঁর শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড চক্রবর্তী এই জায়গায় পৌঁছেছিলেন। কমরেড চক্রবর্তীর অপূরিত কাজ পূর্ণ করার সঙ্কল্প নেওয়ার মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের ওপর রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

কমরেড নীহার মুখার্জীর শ্রদ্ধার্ঘ

পাঁচের পাতার পর

সকলের কাছ থেকে প্রিয় নেতার মর্যাদা পেয়েছেন।

কিন্তু জীবন সংগ্রামে আরও কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চরিত্রের আরও উন্নত মান তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই সংগ্রামের শিক্ষাগুলিকে আমাদের সযত্নে লালন করা প্রয়োজন। তাঁর চরিত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল — আদর্শকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ব্যক্তিস্বার্থমুক্ত এবং কখনই নিজেকে জাহির করতেন না। তিনি ভাল বক্তা ছিলেন না, সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনাও খুব একটা করতেন না। কিন্তু নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এবং নিজের সমগ্র জীবনধারায় তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলিকে একাত্ম করে নেওয়ার জন্য জীবনভোর একনিষ্ঠ সংগ্রাম করেছেন।

এখানেই নিহিত ছিল তাঁর সুস্পষ্ট মর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিত্বের উৎস। এই কারণেই খুব বেশি তত্ত্বগত আলোচনা না করা সত্ত্বেও, তাঁর ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের ওপরেও গভীর ছাপ ফেলেছে এবং পার্টি ও পার্টির আদর্শের প্রতি তাঁদের আকৃষ্ট করেছে। এগুলি দিয়েই বোঝা যায়, অতি সাদা-সিধা এই মানুষটির কী অসাধারণ চারিত্রিক শক্তি ও আদর্শের প্রতি গভীর আনুগত্য ছিল। এই অসাধারণ চারিত্রিক শক্তির জোরেই, একসময় এক নারীর সাথে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠা সত্ত্বেও, যে মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনে ঐ নারী তাঁর জীবনের সাথী হবেন না, সেই সম্পর্ক ছিন্ন করতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। এভাবে একটির পর একটি পরীক্ষা অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী শ্রেণী, বিপ্লব ও দলের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে শুধু সমর্পণ করাই নয়, একাত্ম করে দেওয়ার সংগ্রামে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। এরই স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৮৭ সালে পার্টি তাঁকে স্টাফ সদস্যপদের মর্যাদা দেয়। পরের বছর পার্টি কংগ্রেসের আগে তিনি বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

একথা অনস্বীকার্য যে, নিজেকেই দৃষ্টান্ত হিসাবে রেখে, নেতৃস্থানীয় কমরেডদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার নিরন্তর প্রয়াস এবং কালেকটিভ বডি ফাংশানিং-এর ক্ষেত্রে সর্বাধিক উদ্যোগ নেওয়ার উৎসাহ সৃষ্টির দ্বারা তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী পার্টির অভ্যন্তরে একটা প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরিতে, কর্মীদের ব্যক্তিউদ্যোগ সৃষ্টিতে ও নেতা-কর্মীদের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে অনেকখানি সফল হয়েছিলেন। তাঁর কাজের এই দৃষ্টান্তগুলিকে অনুসরণ করাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ এবং এ পথেই একমাত্র আমরা তাঁর শূন্যস্থানকে যত দ্রুত সম্ভব পূরণ করতে পারব।

কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী লাল সেলাম

এটা কি মৃত্যু পরোয়ানা নয়?

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রতি

অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের আবেদন

ব্যাঙ্ক শিল্পে ৮ম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। এই প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগ্রামী সংগঠন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম আবেদন করেছে যে,

৮ম দ্বিপাক্ষিক চুক্তির দ্রুত নিষ্পত্তি করতে ইউ এফ বি ইউ'র নেতৃত্বে এ আই বি ই এ, এন সি বি ই, বি ই এফ আই প্রভৃতি সংগঠন আই বি এ-র সাথে দফায় দফায় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এই চুক্তির প্রাক্কালে আপনাদের নেতৃত্বের কাছ থেকে যাচাই করে নেওয়ার জন্য কিছু প্রশ্ন তুলে ধরছি।

- এস বি আইতে ১০০% কম্পুটারাইজেশন-এর চুক্তি — যার ফলে ১ লক্ষ কর্মচারী ভি আর এস নিতে বাধ্য হবে এবং ব্যাপক ডিপ্লয়মেণ্টের নামে কর্তৃপক্ষের মর্জিমাফিক যেখানে সেখানে ট্রান্সফার হবে — এ কি এন সি বি ই, এন সি বি ই নেতৃত্ব মেনে নেয় নি?
- এস বি আই-র সাথে অন্য ব্যাঙ্কের জোনাল মার্জার হতে চলেছে — এ কি এন সি বি ই নেতৃত্ব মেনে নেয়নি? এর ফলে কি বহু কর্মচারী উদ্বৃত্ত হয়ে ভি আর এস নিতে বাধ্য হবে না?
- এটা কি সত্য নয় যে, কম্পুটারাইজেশন, ডিপ্লয়মেণ্ট এবং ভি আর এসের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের ব্যাঙ্ক থেকে বিদায় করার লক্ষ্যে এ আই বি ই এ একইভাবে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এস বি আই'র পথ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয় নি?
- গত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আলোচনা চলাকালীন নরসিংহম কমিটির প্রস্তাবগুলি যখন একের পর এক ব্যাঙ্কে কার্যকরী হচ্ছিল, তখন এ আই বি ই এ, বি ই এফ আই, এন সি বি ই ও অন্যসংগঠনগুলোর নেতৃত্ব নীরব দর্শক থেকে কার্যত ঐ সুপারিশগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে নি?
- গত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পর থেকে বাড়তি কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক না দিয়েই ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাজের বোঝা কি বহুগুণ বাড়ানো হয়নি?
- ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল — তাদের চাকুরির শর্ত এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলো কি এ আই বি ই এ, এন সি বি ই, বি ই এফ আই, ও অন্য সংগঠনগুলোর পূর্ণ মদতে কেড়ে নেওয়া হয়নি? তা না হলে যখন বিজনেস আওয়ার বাড়ানো হয়, ১০টা-৫টার বাইরে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, বিভিন্ন ধরনের কাজ একীভূত করা হয় এবং অধিক দায়িত্বের কাজ চাপানো হয়, তখন তা প্রতিরোধ করা হলো না কেন?
- এটা কি সত্য নয় যে, অত্যন্ত অন্যায়ভাবে যারা সি পি এফ ব্যবস্থায় থাকার মত দিয়েছে তাদের সহ সকল কর্মচারীদের পাওনা (গত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফলে যা ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পাওনা হয়েছিল) টাকার একটা অংশ কেটে পেনশন তহবিল তৈরি করতে ব্যয় করা হয়েছে? ঐ টাকা কি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দেওয়ার দায়িত্ব ছিল না?
- বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে কি ব্যাঙ্কের শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়নি? ইউনিয়ন নেতৃত্বের সমর্থন ছাড়া এ কাজ সম্ভব হচ্ছে কি করে? নইলে প্রতিরোধ আন্দোলন হচ্ছে না কেন?
- কারেন্সি নোটের পিন খোলা, নতুন নোটের বাণ্ডিল তৈরি করা সহ সরকারের 'ক্লিন নোট পলিসি'-র সমস্ত কাজ, আউটসোর্সিং ও বাইরে থেকে কনট্রাক্ট-এর ভিত্তিতে লোক এনে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে না কি? এতে কি হাজার হাজার কর্মচারীর কাজ ধ্বংস হচ্ছে না? তাছাড়া 'ক্লিন নোট পলিসি'-র ফলে কর্মচারীদের জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়ার মারাত্মক সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে না? এইসব কাজ ইউনিয়নের নেতৃত্বের সমর্থন বাদ দিয়ে কি করা সম্ভব? আর তা যদি না হয়, এর বিরুদ্ধে কার্যকরী আন্দোলন হচ্ছে না কেন?
- 'ক্লিন নোট' নীতির ফলে ক্যাশ সেকশানে পুরোপুরি যন্ত্রীকরণ ও কমপিউটারাইশেন হয়ে যাবে এবং এর ফলে কি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে হাজার হাজার কর্মচারী উদ্বৃত্ত হয়ে যাবে না?
- এ আই বি ই এ, এন সি বি ই, বি ই এফ আই প্রভৃতি সংগঠনগুলো নরসিংহম কমিটির সুপারিশগুলো কার্যকরী করতে কি সহযোগিতা করেনি? এই সহযোগিতার জন্য কি নরসিংহম কমিটি তাদের দ্বিতীয়দফার সুপারিশে ইউ এফ বি ইউ' নেতৃবৃন্দের প্রশংসা করেনি? এটা কি সত্য নয় যে, বর্তমানে ইউ এফ বি ইউ'র নেতৃত্ব ব্যাঙ্ক মার্জার এর প্রশ্নে আই বি এ-কে সাহায্য করছে? মার্জারের ফলে ব্যাপক কর্মচারী উদ্বৃত্ত হবে না কি? এবং এই উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের ভি আর এসের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে তাড়ানো হবে না কি? এটা কি নরসিংহম কমিটির সুপারিশ নয়? যদি তাই হয়, তাহলে একে কি প্রতিরোধ করার জন্য আন্দোলন করা দরকার ছিল না?
- বল্গাহীন এ টি এম বসিয়ে যখন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ হাজার হাজার চাকরির সুযোগ শেষ করে দিচ্ছে তখন ইউ এফ বি ইউ'র নেতৃত্ব নীরব কেন?
- উপরিউক্ত চূড়ান্ত কর্মচারী ও জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে কবর দিতেই কি ৭.৫% মাহিনা বৃদ্ধির প্রস্তাবকে ৯% এ সংশোধিত করা হচ্ছে?

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলো যদি সত্য হয় তাহলে আগামী ৮ম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি কি ব্যাঙ্ক কর্মচারীর কাছে 'মৃত্যু পরোয়ানা' নয়? তাহলে ভবিষ্যৎ রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়ানোর এটাই কি সময় নয়? ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিবেকের কাছে এই আমাদের প্রশ্ন।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৬ বর্ষ / ৫ সংখ্যা ৮

কমরেড অনিল সর্দার লাল সেলাম

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাবড়ায় পার্টির প্রবীণ সদস্য কমরেড অনিল সর্দার গত ১৬ আগস্ট, শনিবার, ৭৩ বছর বয়সে দুরারোগ্য গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য। ষাটের দশকের শেষ দিকে তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং এস ইউ সি আই দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। আশির দশকে তিনি হাবড়ার বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বৃহত্তর হাবড়ার ২৬টি আদিবাসী পাড়ায় তিনি আদিবাসী ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং ক্ষেতমজুরদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের সফল আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন। পার্টির উন্নত সাংস্কৃতিক মানকে তিনি সাধ্যমত নিজের জীবনে পালন করতে পারার ফলে যেমন এলাকায় সকলের শ্রদ্ধেয় ও আপনজন ছিলেন, তেমনি নিজের পরিবারকেও পার্টির সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন।

গত ২৪ আগস্ট শনিবার, হাবড়া পার্টি অফিসে কমরেড অনিল সর্দারের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন দলের হাবড়া লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অনিল ঘোষ। বক্তব্য রাখেন কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস ও দলের প্রবীণ সদস্য কমরেড রতন সিন্‌হা। প্রধান বক্তা দলের জেলাসম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ তাঁর বক্তব্যে কমরেড অনিল সর্দারের উচ্চমর্যাদাবোধসম্পন্ন জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে দলের আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য কমরেডদের কাছে আহবান জানান।

মার্কিন অর্থনীতিতে তেজিভাব

এজন্যই তো যুদ্ধ !

মার্কিন অর্থনীতির পক্ষে সুখবর। আগস্ট মাসের শেষাশেষির হিসাবে কর্তারা দেখছেন, অর্থনীতি এগোচ্ছে ৩.১ শতাংশ হারে। তাদের আশা, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির বন্ধ্যা দশাটি অচিরেই কেটে যাবে। জি ডি পি'র আকস্মিক বৃদ্ধি দেখে অর্থনীতিবিদরা বিস্মিত।

মরা অর্থনীতিতে কী উপায়ে প্রাণসঞ্চার হল? কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, এবারও সেই পুরনো দাওয়াই — দেশের প্রতিরক্ষার নামে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনে ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামে ব্যয়বৃদ্ধি। দশ/বিশ শতাংশ নয়, এবার আমেরিকার প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো হয়েছে ৪৫.৯ শতাংশ। এমন বিপুল বৃদ্ধি, ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের পর গত ৫০ বছরে আর কখনও করা হয়নি। বাজেটের এই বিপুল ব্যয়ের মধ্য দিয়ে মারণাস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক পণ্যের বিশাল পরিমাণ সরকারি অর্ডার যাচ্ছে মার্কিন কলকারখানায়। তাতেই ওদের চাকা আবার ঘুরছে। ক্রেতা নিয়ে ভাববার দরকার নেই, সরকারই ক্রেতা। যুগোশ্লোভিয়া আফগানিস্তান ও ইরাকে অস্ত্র খালাস হয়েছে অনেক। কিন্তু যুদ্ধ কোথাও শেষ করেনি আমেরিকা, যুদ্ধ না থাকলেই মার্কিন অর্থনীতিতে নাভিশ্বাস ওঠে। একেই বলা হয় অর্থনীতির সামরিকীকরণ। ইরাক আক্রমণের পিছনেও অর্থনীতির সংকট মোচনের এই লক্ষ্য যে ছিল, সেকথা আমরা বারবার বলেছি। এখন তথ্যই প্রমাণ করছে, বিশ্বের বৃহত্তম পুঁজিবাদী অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধ ব্যবসার উপর। মার্কিন অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের রক্ত চাই।

কমরেড লীনা মুখার্জী লাল সেলাম

কমরেড লীনা মুখার্জী আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ২৮ আগস্ট বেলা ১২-৪০ মিনিটে আকস্মিক হৃদরোগে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে।

বীরভূমের সিউড়িতে থাকাকালে অল্পবয়সে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। সত্তরের দশকের শুরুতে তিনি কলকাতায় আসেন এবং কমসোমলের ইনচার্জ হিসাবে একনিষ্ঠ নিরলস প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে কমসোমলকে গড়ে তোলার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দলের প্রথম কংগ্রেসের প্রাক্কালে তিনি কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

কমরেড লীনা মুখার্জী দলের সর্বক্ষণের কর্মী ও সংগঠকই শুধু ছিলেন না, মনেপ্রাণে দলকে তিনি জীবনের ধ্রুবতারা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক তত্ত্ব চর্চায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ছিলেন সুবক্তা, দলের রাজনৈতিক বক্তব্য দক্ষতার সঙ্গে উপস্থিত করার ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে সব জায়গায় পার্টি তাঁকে পাঠিয়েছে তিনি দলের কর্মী-সমর্থক-দরদী ও সাধারণ মানুষের মনে গভীর ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কমরেড লীনা মুখার্জী ছিলেন অত্যন্ত ঋজু, স্পষ্টভাষী ও দৃঢ়চেতা। যখন দলের যে কাজের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন, আগ্রহ, সৃজনশীলতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে তা পালন করার চেষ্টা করেছেন।

নানা অসুখে জর্জরিত থাকায় দীর্ঘদিন তিনি সক্রিয়ভাবে দলের কাজে অংশ নিতে পারছিলেন না। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আকস্মিক ম্যাসিভ কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে অকালে তাঁর জীবনাবসান ঘটল। দল একজন পার্টি-অন্ত-প্রাণ সংগঠককে হারাল।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে পার্টি অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। বিকাল ৬টায় তাঁর মরদেহ পার্টি অফিসে আনা হয়।

পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অনিল সেন তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, এ আই এম এস এস-এর সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী সহ দলের রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ। কমসোমল ও গণফ্রন্টের নেতৃবৃন্দও তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন। উপস্থিত কমরেডরা "কমরেড লীনা মুখার্জী তোমায় আমরা ভুলিনি ভুলব না" স্লোগান এবং লাল সেলামের মধ্য দিয়ে শেষ বিদায় জানান।

মুম্বাই বিস্ফোরণের নিন্দা

আজ (২৭ আগস্ট '০৩) মুম্বাইতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ যাতে ৫০ জন নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এক বিবৃতিতে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন যে, এই ধরনের নির্বিচার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটায় ও পরিবেশকে কলুষিত করে তো বটেই, পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতিতে আঘাত করে ; তদুপরি নানা স্বৈরাচারী ব্যবস্থা চালু করার সহজ অজুহাত বুর্জোয়া সরকারগুলির হাতে তুলে দেয়। তিনি এই ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

গোহত্যা বিরোধী বিল উদ্দেশ্যমূলক

সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে তথাকথিত 'গোহত্যা বন্ধ' বিল পেশ করার জন্য বিজেপি'র নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, সংখ্যালঘু জনগণের মৌলিক অধিকারের উপর আক্রমণ করার সাথে সাথে, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু জনগণের মধ্যে আরও বিভেদ সৃষ্টি করে ভোটে তার ফয়দা তোলার অত্যন্ত অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিল আনার তোড়জোড় করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রবল সাম্প্রদায়িক মতলবপূর্ণ প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার জন্য তিনি সকল অংশের জনগণের প্রতি আহবান জানান।

সরকারি কমিটিতে বিদ্যুৎগ্রাহকদের প্রতিনিধি নেই কেন ?

বিদ্যুৎমন্ত্রীকে অল বেঙ্গল ইলেট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের চিঠি

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩কে কার্যকরী করে রাজ্যের বিদ্যুৎ শিল্পকে পুনর্গঠন করার জন্য রাজ্য সরকার রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক সুবিমল সেনকে চেয়ারম্যান করে ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটির নাম দেওয়া হয়েছে ''The State Level Committee on Restructuring of Distribution System in the Power Sector.'' এই কমিটির পক্ষ থেকে গত ২২ আগস্ট অ্যাবেকাকে চিঠি দিয়ে বিদ্যুৎ পর্ষদ সহ সমগ্র বিদ্যুৎ শিল্পকে পুনর্গঠন করার জন্য অ্যাবেকার মতামত চাওয়া হয়েছে।

অ্যাবেকার পক্ষ থেকে ২৮ আগস্ট এ বিষয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে কেন পুনর্গঠন কমিটিতে রাজ্যের একমাত্র গ্রাহক সংগঠনের প্রতিনিধিকে নেওয়া হয়নি এবং পুনর্গঠন সম্পর্কে রাজ্য সরকারের বক্তব্য এবং পুনর্গঠন কমিটিকে কি কি বিষয়ে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

অ্যাবেকার সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস চিঠিতে বলেছেন যে, যেহেতু এ সব বিষয়ের কোন কিছুই পুনর্গঠন কমিটি জানায় নি, তাই সমিতি এখন মতামত দিতে পারছে না

টিনা বাজার হাইড রোড এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ৭০০ পরিবারের ঝুপড়ি উচ্ছেদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে নাগরিক উন্নয়ন সমিতির নেতৃত্বে ২৯ আগস্ট বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পোর্ট ডি সি-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের ঝুপড়ি উচ্ছেদ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবিতে নাগরিক উন্নয়ন সমিতি দীর্ঘদিন লড়াই চালাচ্ছে।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net